Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 161–172
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

'হলদে গোলাপ', লিঙ্গতত্ত্ব ও পাঠকের অন্তঃমনন চেতনা

ড. মৃদুল ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক
কোচবিহার কলেজ, কোচবিহার
ই-মেইল : mg31282@gmail.com

Keyword
হলদে গোলাপ, এল জি বি টি, যৌন চেতনা, মনন, অনিকেত, আইভি, দুলাল, পরি, সোমনাথ

Abstract
'সমাজের শরীর ও শরীরের সমাজতত্ত্ব নিয়ে দুঃসাহসিক উপন্যাস হলদে গোলাপ'। লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্যা ও তত্ত্বের বাস্তবায়নে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী কাহিনীতে জীবনের বহুকৌণিকতার আসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। নৃবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শারীর বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, প্রজনন বিদ্যার সঙ্গে মিথ পুরাণের মিশ্রণে সমাজ মানসের বিশিষ্ট মানসিকতা তুলে ধরেছেন। কাহিনী বয়নের অসামান্য গুণে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব প্রকাশে দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত এসেছে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্স জেন্ডার তত্ত্বের বাস্তব চিন্তা ভাবনায় বিশ্বাসী মানুষদের কথা। অনিকেত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাজের মাসির ছেলে দুলাল বহিরঙ্গে পুরুষ হয়েও অন্য এক পুরুষ লছমন যাদবের সঙ্গে নথ ভাঙ্গার অনুষ্ঠানে যেতে দ্বিধা করে না। দুলালের ছেলে মন্টু সমকামী। সে স্কুল থেকে ছেলে বন্ধুকে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। আইভি মেয়ে হলেও স্বভাব ও মানসিকতায় পুরুষ। বিকাশ পারমিতাকে ভালোবাসলেও তাঁদের দত্তক ছেলে নীলের আচরণে স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়। হিজড়েদের কাউন্সিল ক্লাবে দাড়ি গোঁফ ওয়ালা পরিমল এর আচরণ সমকামী মেয়েদের মতো। তাই তৃপ্তির মতো মেয়েকে পরিমল কাছে পেতে চায়। সোমনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'মানবী' হওয়ার রহস্য কথায় তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের বিচিত্র সমাবেশ। সমকামী মেয়ে, সমকামী পুরুষ, উভয়লিঙ্গে আকৃষ্ট নারী-পুরুষ, যৌন লক্ষণহীন নারী বা পুরুষদের জীবন কীভাবে স্বাধীন পথে অগ্রসর হতে পারে তারই মনোমুগ্ধকর কথাবিন্যাস এই উপন্যাস। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে উল্লিখিত তত্ত্ব সমুহের বাস্তবায়নে পাঠক মনন কীভাবে আন্দোলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করব।

Discussion
বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম নক্ষত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫২)। ১৯৭২ সালে মনীন্দ্র রায় সম্পাদিত 'অমৃত' পত্রিকায় লেখা গল্প দিয়ে লেখার ছবিতে হাতে খড়ি। এরপর লিখেছেন 'পদাবলী', 'কল্পবাণী', 'উত্তরকাল', 'চতুরঙ্গ', 'অনুষ্টুপ' এবং 'মধ্যাহ্ন' পত্রিকায়। জীবনের শুরুতে দেশলাইয়ের সেলসম্যান, শেষের তিন বছর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট এর কর্মী। মাঝে নানা জীবিকা বদলের পর আকাশবানীতে দীর্ঘকালের কাজের অভিজ্ঞতা। 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের পটভূমি জুড়ে রয়েছে সেই প্রত্যক্ষ বাস্তবের অপূর্ব কথা। ১৯৭৩-১৯৭৭ সময়ের মধ্যে প্রায় লেখেননি বলা

চলে। তেমন লেখেন নি, কেবল গল্পের উপাদান চিবিয়ে খেয়েছেন। কোলকাতার বাগবাজার এলাকার গলির ছেলে গ্রাম বাংলার গভীরে মাটির কাছাকাছি মানুষকে আবিষ্কার করলেন বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে। লেখকের চোখে ক্রম-উন্মোচিত হতে লাগল গ্রামবাংলার রায়ত, আধিয়ার, কোর্ফা, মাহিন্দার শ্রেণির স্বরূপ। তাদের নিয়ে লিখলেন পর পর কয়েকটি গল্প। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের যাদব-কুর্মি-ভূমিহার; ছাতু-লিট্টি; লোন্ডা-ঝুমুর সম্প্রদায়ের মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে 'ভূমি-ভূস্বামীর ভূত ও ভবিষ্যত' নামে প্রবন্ধ লিখে ফেলেন একটি ছোট কাগজে। ভূমি-রাজস্ব দফতরে চাকরির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই প্রবন্ধটি। 'অনুষ্টুপ' এর সম্পাদক অনিল আচার্য'র অনুরোধে প্রবন্ধ লিখলেও গল্প রচনাতেই তাঁর অধিক স্বচ্ছন্দবোধ, একথা জানাতে ভোলেননি।

১৯৭৮ সালে সুরজিৎ ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'প্রমা' নামে একটি পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন অরুণ মিত্র, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার প্রমুখ। উঁচু মানের এই পত্রিকাতে নিয়মিত লিখতেন মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সৌরীন ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার দাশ, জয়ন্ত জোয়ারদার, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ মজুমদার। পবিত্র সরকার তখন শিকাগো থেকে ফিরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার পড়াচ্ছেন। উনিই সুরজিৎ ঘোষকে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কথা প্রথম বলেন। তাঁর প্রমা-য় লেখা প্রথম গল্প সম্ভবত 'ভাল করে পড়গা ইস্কুলে'। ১৯৮০ সাল নাগাদ মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ ঘোষ 'প্রমা' পত্রিকার উদ্যোগে বই প্রকাশনার পরিকল্পনা শুরু করেন। ১৯৮২ সালের বইমেলায় 'প্রমা' থেকে লেখকের গল্প বই 'ভূমিসূত্র' প্রকাশিত হয়। কৃষি মজুর, বর্গাচাষি, ভূমি সংস্কার করতে আসা সরকারি কর্মচারি, জোতদার, এরাই ছিল গল্পগুলির সব মুখ্য চরিত্রে। পদার্থবিদ্যার 'শক্তির নিত্যতা সূত্র'র কথা মাথায় রেখে গ্রন্থের একটি গল্পের নাম রেখেছিলেন 'ভূমির নিত্যতা সূত্র'। অর্থাৎ ভূমিহীনদের জমি বিলি করা হলেও শেষপর্যন্ত ভূমি আবার পুরোনো মালিকদের কাছেই ফিরে আসে। এই সূত্রের প্রতিপাদ্য ছিল শক্তির বিনাশ নাই— সে কেবল রূপ পালটায়। এভাবেই 'প্রেমের গল্প', 'পঞ্চাশটি গল্প', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'অনুগল্প সংগ্রহ', 'পরবাসী', 'চার ডাক্তার', 'সাদা কাক', 'ভেজা বারুদ', 'কথাবলা পুতুল' এর লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বাংলা কথা সাহিত্যে সম্মানের আসন অধিকার করে নেন। ২০০৫ সালে 'অবন্তীনগর' উপন্যাসের জন্যে বঙ্কিম পুরস্কার পান লেখক। এছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার, সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার ইত্যাদিতে সম্মানিত হয়েছেন তিনি।

'হলদে গোলাপ' উপন্যাসটি ২০১২-১০১৩ সালে ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত 'রোববার'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। ২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর উপন্যাসটির জন্য লেখককে ১৪২১ সালের আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। লিঙ্গ পরিচয়ের সংকট উত্তরণের কথা নিয়ে লেখা কাহিনিতে নৃবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, জিনতত্ত্ব, ক্লাইনফেল্টার, টার্নার সিনড্রোম, ক্রোমোজোমের খামখেয়ালিপনা শারীর বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, মিথ, পুরাণের আশ্চর্য সমন্বয় সাধন ঘটিয়েছেন। সেক্স চেঞ্জ বিষয়টি চিকিৎসাশাস্ত্রে মাত্র কয়েক দশকের পুরোনো বলে বাংলা উপন্যাসে সে ভাবে আসেনি। এই প্রসঙ্গটি বাংলা কথাসাহিত্যে হয় নৈঃশব্দ দ্বারা অথবা ঊনকথনে আবৃত ছিল। স্বপ্নময় চক্রবর্তী হাল আমলের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে সেই নৈঃশব্দ এবং ট্যাবু ভেঙেছেন। রূপান্তরকামী পুরুষের কৃত্রিম স্তন প্রতিস্থাপন যে মাত্র কয়েক ঘন্টার অপারেশন, তা জানিয়েছে উপন্যাসের অন্যতম নায়ক পরি। মার্কিন ঔপন্যাসিক গোর ভাইডালের 'মাইরা ব্রেকিনরিজ' উপন্যাসের নায়িকা মাইরা তার এক ছাত্রকে ধর্ষণ করে, পরে গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়। বোঝা যায়, মাইরা আসলে মাইরন নামে এক পুরুষ। দুর্ঘটনায় মাইরার কৃত্রিম ব্রেস্ট ইমপ্লান্ট নষ্ট হয়ে যায়, হরমোন থেরাপি আর কাজে আসে না। এই উপন্যাসের কথা প্রসঙ্গে লেখক আমাদের শুনিয়েছেন ফ্রয়েড, ইয়ুং, পাভলভ, কেইনস, অলডাস হাক্সলে থেকে টিন্ডাল, স্পেন্সার, বাংলার আশীষ লাহিড়ীর মতো বিজ্ঞান-দার্শনিকদের কথা। বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যকে এক সূত্রে গ্রথিত করে তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক ভারতীয় কথা সাহিত্যের স্রষ্টা। এক দশক আগে জাপানি ঔপন্যাসিক মুরাকামি রচিত 'কাফকা অন দ্য শোর' উপন্যাসের ট্রান্সজেন্ডার লাইব্রেরিয়ান চরিত্র ওশিমা যে ভাবে আমদের বোধ বদলে দিয়েছিল, 'হলদে গোলাপের' লেখক একইভাবে আমাদের বোধ পালটে দেয়।

লিঙ্গ পরিবর্তনের ধারণা প্রাচ্য ও পাশ্চত্য দেশে সমান গতিতে অগ্রসর হয়েছে। গ্রিক উপকথায় টাইরেসিয়াসের কাছে দেবরাজ জিউস ও তাঁর স্ত্রী হেরা এসে প্রশ্ন করেন, 'সঙ্গমে কার আনন্দ বেশি'? টাইরেসিয়াস নারীর কথা বললে হেরা রেগে তাঁকে মেয়েতে পরিণত করে দিতে বলেন। পরে দেবরাজ জিউস তাঁকে আবার পুরুষ করে দেন। আর ভারতীয় স্কন্দপুরাণে হরপার্বতীর পূজারিণী সোমবন নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে নারীতে রূপান্তরিত করে দেন। ব্রাহ্মণ কান্নাকাটি করলেও শিব অনড়, 'আমার ভক্তর কথায় এটি হয়েছে। তাই নড়চড়ের ক্ষমতা আমার নেই'। ভক্তের কথায় লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটে গেলে মেনে নিতেই হবে। স্বয়ং ঈশ্বরেরও সেটি ওলটপালট করবার ক্ষমতা নেই। রতিসুখের কারণে মেয়ে হতে চাওয়া তো মহাভারতীয় চেতনা। অনুশাসনপর্বে ভঙ্গাসন নামে এক রাজার কথা আছে। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের অভিশাপের চক্করে তিনি মেয়ে হয়ে গিয়েছিলেন। পরে ইন্দ্র বর দিতে এলে তিনি মেয়ে হয়ে থেকে যেতে চাইলেন। কারণ, যৌনতায় মেয়েদের আনন্দ পুরুষের চেয়েও বেশি। লিঙ্গপরিচয়ের সঙ্কট থেকে সরে এসে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন,

> "স্বপ্নময় ঢাকা দেওয়া অবাঞ্ছিত সত্যের উন্মোচন করা এক সচেতন লেখক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি যত এগোবে, সাহিত্যের ভাষাও বদলাবে। [১]

লিঙ্গচ্ছেদ বা লিঙ্গ পরিবর্তন বহু প্রাচীনকাল থেকে নানাভাবে প্রচলিত। মহাভারতে শিখণ্ডীর বিয়ে হল। শ্বশুর চেদিরাজ যখন শুনলেন, জামাইটি নপুংসক; ঠকিয়ে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছে তখনই তিনি দ্রুপদের রাজ্য আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। শিখণ্ডী অরণ্যে পালিয়ে গিয়ে স্থূণাকর্ণ নামে দয়ালু এক যক্ষের সঙ্গে লিঙ্গ বিনিময় করে পুরোদস্তুর পুরুষ হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। ভারতীয় এই ধ্রুপদী ঐতিহ্য যাঁরা ভুলে গিয়েছেন, তাঁরাই 'ঘর ওয়াপসি' খোঁজেন, সমকামিতা ও রূপান্তরকামিতাকে বিদেশি পাপ বলে গণ্য করেন। হলদে গোলাপের ঘ্রাণে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব কথার সুচিন্তিত প্রয়োগে সমুজ্জ্বল। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রূপান্তরকামী ভাবনা ও তত্ত্ব এই বইয়ে একাকার। রেডিও স্টেশনের কর্মী আইভি, পরিমলের কলেজের সহপাঠী খেলোয়াড় তৃপ্তি, নারী শরীর নিয়ে পুরুষের ন্যায় আচরণ করে। একদিকে ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরিমল নারী হতে চায়, অন্যদিকে হিজড়ে দুলালী পূজা করে লোকায়ত দেবী বহুচেরা মায়ের। গুজরাটের মন্দিরে তাঁর পূজার উৎসবের দিন ভারতের সব হিজড়ে জমায়েত হয় সেখানে। দুলালের ছেলে মন্টু শারীরিক গঠনে ছেলে হলেও অন্য ছেলের সঙ্গে যৌন সংসর্গে মেতে ওঠে। সব মিলিয়ে এই উপন্যাসটি আসলে সমকামী স্ত্রীলোক (Lesbian), সমকামী পুরুষ (Gay), উভয়কামী নারীপুরুষ (Bisexual), লিঙ্গ রূপান্তরকামী (Transgender) মানুষদের নিয়ে গবেষণামূলক উপন্যাস।

সমাজ গঠনের ঊষালগ্ন থেকে জগৎ চরাচরে লিঙ্গ পরিচিতির ধারা প্রচলিত। মানব সমাজে প্রচলিত লিঙ্গ দ্বিবিধ। পুং ও স্ত্রী। কিন্তু ব্যাকরণের ধারার মতো মানব সমাজের সর্বত্র কম বেশি চোখে পরে ক্লীবধর্মী তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের। কেউ দেহাবয়বে নারী বা পুরুষ, মন ও মননে তার বিপরীতধর্মী। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে এই মানুষদের মনের বাসনা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছে। পৃথিবীব্যাপী এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা সমাজের চোখে ঈশ্বরের ত্রুটিপূর্ণ শিশু, কিশোর, কিংবা হিজড়ে, মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ বা পুরুষ স্বভাবের নারী। সামাজিক ভাবে নারী কিংবা পুরুষ সমাজের কাছে হেয়, কটুক্তির পাত্র, ব্যাঙ্গরসের আধার। সামাজিক বঞ্চনা, হিংসা, অবমাননা, অসম্মান তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী। সামাজিক অসম্মানের হাত থেকে মুক্তি পেতে এরা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকলে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত হয়। জন্ম নেয় বিভিন্ন তত্ত্বের। এই ধারায় এসেছে 'কুইর' (Queer), 'লেসবিয়ান' (Lesbian), 'গে' (Gay), 'বাইসেক্সুয়াল' (Bisexual), 'ট্রান্সসেক্সুয়াল' (Transsexual), 'অ্যাসেক্সুয়াল' (Asexual) ইত্যাদি নানা তত্ত্ব।

১৯৭০ এর দশকের শুরুতে পোস্ট-স্ট্রাকচারাল তত্ত্ব, বিশেষ করে ডিকনস্ট্রাকশন তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয় কুইর তত্ত্ব। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর শারীরিক, মানসিক চিকিৎসাশাস্ত্র, যৌনতার ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন লেখায় কুইর তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। ১৯৯০ সালে ইভ কোসফস্কি সেডগউইক, লরেন বার্লান্ট, লিও বারসানী, জুডিথ

বাটলার, লি এডেলম্যান, জ্যাক হেলবারস্টাম, অ্যাড্রিয়েন রিচ এবং ডায়ানা ফাস প্রমুখেরা ফুকোর মতাদর্শের অনুসরণে কুইর তত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই তত্ত্ব মুলত লিঙ্গ বৈষম্য, যৌন পরিচয়ের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে। পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে নিপীড়ন এবং বিশেষাধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে। কুইর তত্ত্ব হল লিঙ্গ এবং যৌনতার শ্রেণীবিন্যাস ব্যাখ্যা এবং প্রতিযোগিতা। Annamarie Jagose(1996) কুইর তত্ত্বের ব্যখ্যায় লিখেছেন,

> "Queer focuses on mismatches between sex gender and desire. For most, queer has been prominently associated with those who identify as lesbian and gay. Unknown to many, queer is in association with more than just gay and lesbian, but also cross-dressing, hermaphroditism gender ambiguity and gender-corrective surgery."[২]

কুইর থিওরিস্ট মাইকেল ওয়ার্নার এই ধারণাটিকে আরও দৃঢ়ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তত্ত্ববিদ ক্যাথি কোহেন কুইর তত্ত্বের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের মিলন ঘটিয়েছেন। পরবর্তীকালে ইয়ান বার্নার্ড, অ্যাডাম গ্রিন, জন ডি'মিলিও প্রমুখরা সমকামী পুরুষ এবং সমকামী স্ত্রীলোকের উত্থানের সঙ্গে উনিশ শতকের পুঁজিবাদকে যুক্ত করেছেন। লিঙ্গ পরিচয়ের সংকটে বিপন্ন মানুষদের নিয়ে নানা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জন্ম নিয়েছে LGBT নামক একটি বিশিষ্ট শ্রেণির মানুষের।

অ্যালার্জেনন চার্লস সুইনবার্ন ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কবিতায় 'সমকামী' (Lesbian) শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৮৭৫ সালে বউডেলির কবিতা সম্পর্কে লেখা জর্জ সান্টসবারি 'লেসবিয়ান স্টাডিজ' এর কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে চিকিৎসা সাহিত্যে 'সমকামী' শব্দের ব্যবহার বিশিষ্ট হয়ে ওঠে পায়ুকামী মহিলার সমতুল বিশেষ্য বাচক শব্দ হিসেবে। ১৯৭০ এর প্রথমদিকে লেসবিয়ান নারীবাদ (Lesbian Feminism)তত্ত্বের সূচনা হয়। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা শিলা জেফ্রিইস (Sheila Jeffreys) প্রথম লেসবিয়ান ফেমিনিজম এর কথা বলেন। এছাড়া সমকামী নারীবাদীদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান চিন্তাবিদ ও কর্মী হলেন চার্লট বাঞ্চ (Charlotte Bunch), রিটা ম্যা ব্রাউন (Rita Mae Brown), অ্যাড্রিয়েন রিচ (Adrienne Rich), অড্রে লর্ড (Audre Lorde), ম্যারিলিন ফির (Marilyn Frye), মেরি ড্যালি (Mary Daly) এবং মনিক উইট্টিগ (Monique Wittig) প্রমুখ। সমকামী নারীবাদ ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে নারীরা পুরুষদের চেয়ে বরং অন্য নারীর প্রতি অধিক আসক্তি প্রকাশ করে এবং প্রায়ই নারীবাদকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিচার করে। ১৯৭৪ সালে যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির প্রথম সমকামী নারী মাওরিন কলকৌন এম. পি. হয়েছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন ফরাসী ভাষার 'গেই'(Gai) শব্দটি জার্মানীর মধ্যে দিয়ে ইংরেজিতে পৌঁছেছিল 'গে'(Gay) হিসেবে। 'গে'(Gay) এমন একটি শব্দ যা প্রাথমিকভাবে সমকামী বা সমকামী হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। শব্দটি মূলত 'অপ্রত্যাশিত', 'আনন্দদায়ক', 'নিরুৎসাহিত', 'উজ্জ্বল' এবং 'শোভনীয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১৯৬০-এর দশকে 'গে' সমকামী যৌনকর্মীদের দ্বারা তাদের যৌন বর্ণনা করার পক্ষে অভিব্যক্ত হয়। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে 'সমকামীতা' শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে এবং বিশ শতকে এর ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটছে। আধুনিক ইংরেজীতে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ হিসেবে শব্দটি ব্যবহৃত হলেও এটি সমকামীতার সঙ্গে যুক্ত সংস্কৃতি ও পুরুষের সমকামী অনুশীলনকে বোঝায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে 'গে' শব্দটি 'সমকামী যৌনতা' হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে অর্থাৎ এই সময়ে শব্দটিতে যৌন দ্যোতনা যুক্ত হয়। এই সময় থেকে সিনেমা, নাটক, কথা সাহিত্য, কাব্য কবিতায় 'গে' শব্দের প্রয়োগ শুরু হয়। এভাবে সমকামী যৌনতার সঙ্গে পতিতাবৃত্তির আবেদন যুক্ত হয়। এখানে পতিতাবৃত্তি অর্থে একজন পুরুষের সঙ্গে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গমের কথা বলা হয়েছে। 'ব্রিংগিং আপ বেবি' (১৯৩৮) হল প্রথম চলচ্চিত্র যেখানে সমকামীতা বোঝাতে 'গে' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।

ইংল্যান্ডের অধ্যাপক ও সমাজকর্মী অ্যালফ্রেড এ গ্রস ১৯৩৭ সালে এঙ্গলিকান যাজক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে সমকামীতার জন্য বরখাস্ত হন। তিনি প্রথম সমকামী হিসেবে নিজের উদ্দেশ্যে 'গে' শব্দ প্রয়োগ করেন। এরপর নিউইয়র্কের খ্যাতিসম্পন্ন সমকামী মানসিক বিশেষজ্ঞ ড. জর্জ ডব্লু হেনরির পরামর্শে সমকামী মানুষদের অধিকারের কথা তুলে ধরেন। ১৯৫০ সাল থেকে সমকামীদের জন্য স্ব-বর্ণিত নাম হিসাবে 'গে' শব্দটি বর্তমান কাল অবধি ব্যাপ্ত হয়েছে। গ্রস দেখেছিলেন সমাজের সমকামী হিসেবে সবচেয়ে দুঃখী মানুষদের। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে পুরুষ সমকামীতা যৌন অপরাধ, অবৈধ, আপত্তিকর ও অপরাধমূলক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হত। লিন্ডা ওয়াগনার-মার্টিন এর মত অনুসারে 'সমকামী' শব্দটি চিত্তাকর্ষক, পুনরাবৃত্তি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ভাষাগত ব্যবহারের দিক থেকে শব্দটি প্রথম যৌন আবেদনের অভিপ্রেত ইচ্ছা হিসেবে ব্যবহৃত হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সমাজকর্মীদের প্রচেষ্টায় পুরুষ সমকামীরা নিজেদের 'গে' হিসেবে অভিহিত করে তাদের অধিকার রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, সচেতনভাবে সমকামী সম্প্রদায়ের পুরুষ এবং মহিলাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন 'গে' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান। সে কারণেই গড়ে ওঠে 'জাতীয় গে টাস্ক ফোর্স', 'ন্যাশনাল গে এবং লেসবিয়ান টাস্ক ফোর্স'। যারা সমাজকে নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় গে-রা লেসবিয়ান নারীকে অনুসরণ করতে থাকে। ফলে নারীদের উপর পুরুষ কর্তৃত্বের একটি নতুন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। একই ভাবে অন্যান্য মহিলাদের সমকামী ব্যবহার পছন্দ করতে থাকে লেসবিয়ান নারীরা। ১৯৯০ এর দশক থেকে 'লেসবিয়ান' ও 'গে' শব্দের সমান্তরাল শব্দ হিসেবে উভকামী, ট্রান্সসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, ইন্টারসেক্স এর ব্যবহার শুরু হয়। পৃথিবীব্যাপী সমলিঙ্গে আকর্ষণ বোধ করা মানুষেরা তাদের অধিকার, সম্মান, মর্যাদা ফিরে পেতে যে বিস্তর প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়েছিল, সে ভাবনা থেকে 'গে' তত্ত্বের প্রয়োগ ও প্রসার ক্রমে সহজ হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে ঘোষিত ১৮৬১ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় সমকামকে যৌন অপরাধের তকমা দেওয়া হয়েছিল। ২০১৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সমকামী, রূপান্তরকামী, উভকামী তথা এলিজিবটি সম্প্রদায়ের মানুষের নিজেদের পছন্দ মতো সঙ্গী বেছে নিয়ে ভালবাসা ও যৌন তৃপ্তি পাওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।

Bisexuality বা উভকামিতা বলতে বিপরীত লিঙ্গের ব্যাক্তির প্রতি রোমান্টিক আকর্ষণ, যৌন আকর্ষণ অথবা যৌন আচরণকে বোঝায়। অথবা যে কোন যৌনতা বা লিঙ্গ পরিচয়বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি রোমান্টিক বা যৌন আকর্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিটিকে বোঝাতে অনেক সময় 'সর্বকামিতা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 'বাইসেক্সুয়ালিটি' শব্দটি পুরুষ এবং নারী উভয়ের যৌন বা রোমান্টিক অনুভূতির ইঙ্গিত হিসেবে ব্যবহার সবচাইতে বেশি। উইকিপিডিয়া থেকে জানতে পারি,

> "The term bisexuality is mainly used in the context of human attraction to denote romantic or sexual feelings toward both men and women, and the concept is one of the three main classifications of sexual orientation along with heterosexuality and homosexuality, all of which exist on the heterosexual – homosexual continuum. A bisexual identity does not necessarily equate to equal sexual attraction to both sexes; commonly, people who have a distinct but not exclusive sexual preference for one sex over the other also identify themselves as bisexual."[৩]

অর্থাৎ বাইসেক্সুয়ালিটির ধারণাটি সমান্তরালভাবে নারী পুরুষে বা যে কোনও লিঙ্গের সঙ্গে যৌন আচরণকে নির্দেশ করে। ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকে মানবসভ্যতার বিভিন্ন সমাজিক স্তরে এবং প্রাণীজগতের বহু প্রাণীর মধ্যে উভকামিতা লক্ষ করা যায়। তবে মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীতে হেটেরোসেক্সুয়ালিটি ও হোমোসেক্সুয়ালিটি শব্দ দুটির মত বাইসেক্সুয়ালিটির বহুল প্রচলন ঘটে।

আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন এর মতে একজন মানুষের যৌন চেতনার অভিযোজন হল তার বয়ঃক্রমের ধারাবাহিক আত্মউপলব্ধি। সেই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিষমকামিতা, সমকামী বা উভকামী

মানসিকতার প্রকাশ পায়। বিভিন্ন স্তর পরম্পরায় এই মানসিক অবস্থা সামাজিক বিভেদ বা বৈষম্য সৃষ্টি করলে তার লৈঙ্গিক স্বাতন্ত্র্য ধরা পরে। এভাবে কোনও মানুষের উভকামিতার প্রকাশ ঘটে। ১৯৪০-এর দশকে প্রাণীবিজ্ঞানী আলফ্রেড কিনসে মানুষের যৌনক্ষেত্রে সমকামী চেতনা তথা সমকামিতার দিকের তীব্র যৌনমিলনের ইচ্ছা পরিমাপ করার জন্য একটি স্কেল তৈরি করেছিলেন। Kinsey স্কেল একটি ব্যক্তির যৌন অভিজ্ঞতা বর্ণনা বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিক্রিয়া নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। কিনসের স্কেল অনুসারে যারা শূন্যতে অবস্থান করে তারা সম্পূর্ণ বিষমকামী। যারা ৬ রেঞ্জ এ তারা সম্পূর্ণ সমকামী। ২ থেকে ৪ রেঞ্জ এ থাকা মানুষেরা উভকামী বলে বিবেচিত হয়। মার্টিন এস ওয়েইনবার্গ এবং কলিন জে উইলিয়ামস জানিয়েছেন যে, নীতিগতভাবে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত যে কোনও রেঞ্জ এর মানুষেরা উভকামী (Bisexual)। ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানী কিনসে মানব পুরুষের যৌন আচরণ বিষয়ক গবেষণায় দেখেছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জনসংখ্যার ৪৬% বিষমকামী ও সমকামী উভয় যৌন কার্যকলাপ জড়িত থাকে। রোজারিও এট আল একটি অনুদৈর্ঘ্য গবেষণায় দেখিয়েছিলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমকামী, গে, এবং উভকামী (এলজিবি) তরুণদের মধ্যে যৌন পরিচয় পালটে নেবার প্রবণতা বাড়তে থাকে। এ থেকেই Transsexual বা রূপান্তরকামী মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সিগমুন্ড ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি পুরুষ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে উভকামী। তাঁর দৃষ্টিতে যৌন আকর্ষণ ছাড়াও শারীরিক ও মানসিকভাবে বাইসেক্সুয়ালিটির প্রতি মানুষেরা নানভাবে আকর্ষণ বোধ করে। শারীরিক দিক থেকেও এটি সমানভাবে সত্য। স্যান্ডর রাডো, এডমন্ড বার্গার, অ্যালান পি বেল, মার্টিন এস ওয়েইনবার্গ এবং সু কিফার হ্যামারস্মিথ উভকামী বা সমকামী তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। National Health Interview Survey সংস্থা জুলাই ২০১৪ এর রিপোর্ট জানিয়েছে যে শুধুমাত্র 0.৭ শতাংশ আমেরিকান উভকামী বলে চিহ্নিত। আমেরিকা থেকে এই বাইসেক্সুয়ালিটির তত্ত্বটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তারলাভ করে। বিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে একবিংশ শতেকের দুই দশক জুড়ে সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে উভকামী চরিত্রেরা নানাভাবে নিজেদের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করে চলেছে।

১৯২১ সালে ম্যাগনস হির্সফেল্ডের তত্ত্বাবধানে জার্মানির ডোরা আর অস্ত্রোপচারের দ্বারা লিঙ্গ রুপান্তরীকরণের কাজটি শুরু করেন। ১৯৩০ সালে হির্সফেল্ড দ্বিতীয় যৌনাঙ্গ পুনর্নির্মাণের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। ১৯২৩ সলে হির্সফেল্ড (জার্মান) 'ট্রান্সসেক্সুয়ালিজমুস' (Transsexualismus) রূপে শব্দটি সূচনা করেন। এরপর ডেভিড অলিভার কলডওয়েল ১৯৪৯ সালে ইংরেজিতে 'ট্রান্সসেক্সুয়ালিজম'(Transsexualism) এবং ১৯৫০ সালে 'ট্রান্সসেক্সুয়াল' (Transsexual) শব্দের প্রবর্তন করেন। কলডওয়েল শারীরিক যৌনতার পরিবর্তন চাওয়া মানুষদের জন্য শব্দটি প্রথম ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। হ্যারি বেনজামিন ১৯৬৯ সালে দাবি করেন যে ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে দেওয়া একটি বক্তব্যে তিনি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে জন অলিভেন 'ট্রান্সসেক্সুয়াল' (Transsexual) শব্দটি 'ট্রান্সজেন্ডার' (Transgender) রূপে পরিচিত করেছিলেন। ১৯৯০ এর দশকে 'ট্রান্সজেন্ডার' (Transgender) শব্দটি সর্বাধিক প্রসার লাভ করে এবং যে কোনো রুপান্তরকামী মানুষেরা নিজেদের 'ট্রান্সজেন্ডার' বলতে অধিক স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

রূপান্তরকামিতা (Transsexualism) বলতে বিশেষ একটি প্রবণতাকে বোঝায়, যা প্রকৃতিগত ভাবে প্রাপ্ত 'জৈব লিঙ্গ' বা সেক্স থেকে নিজেদের আলাদা ভাবতে শুরু করে। 'ট্রান্সজেন্ডার' মানুষেরা দৈহিক গঠনে নারী বা পুরুষ হয়ে মানসিক দিক থেকে নিজেদের তার বিপরীত লিঙ্গের মানুষ ভাবতে শুরু করেন। ফলস্বরূপ তারা নানাভাবে সামাজিক দুর্ব্যবহার ও হতাশা অনুভব করেন। এক্ষেত্রে তারা তাদের লিঙ্গ হতাশা দূর করতে নানা ধরণের ডাক্তারি থেরেপি, চামড়া ও টিস্যু গ্রাফটিং, প্লাস্টিক সার্জারি কিংবা হরমোন থেরেপির সাহায্য নিয়ে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে নতুন চিকিৎসার দ্বারা মানুষের রূপান্তরকামিতা বৃহত্তর সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমেরিকার পুরুষ রূপান্তরকামী জর্জ জরগেন্সেন এর ক্রিস্টিন জরগেন্সেনের রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনি গণমাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়া জোয়ান অব আর্ক, জীববিজ্ঞানী জোয়ান(জনাথন) রাফগার্ডেন, বাস্কেটবল খেলোয়াড় ডেনিস রডম্যান, চক্ষুচিকিৎসক এবং পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় ড. রেনি রিচার্ডস, সঙ্গীতজ্ঞ বিলিটিপটন সহ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির

মধ্যে রূপান্তর প্রবণতার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে মনোচিকিৎসক ওয়ালিন্দার রূপান্তরকামীদের উপরে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন আমেরিকা, ইরান, থাইল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রতি বছর বহুল পরিমানে রুপান্তরকামী মানুষেরা জন্ম নিচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী অ্যান ওকলের মতে, যৌনতা (সেক্স) শারীরিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। আর লিঙ্গ (জেন্ডার) একটি নির্দিষ্ট সমাজে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত বিশিষ্টতা নির্দেশ করে। একজন নারী ও পুরুষের কার কী রকম পোশাক-পরিচ্ছদ হবে; কে কী রকম আচার-আচরণ করবে; আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা কার কী রকম হবে; সমাজের নানা ধরণের কাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের ভূমিকা কী হবে এই বিষয়গুলো নির্ধারণ করে জেন্ডার বা লিঙ্গ। অর্থাৎ সেক্স বা যৌনতা বিষয়টি পুরোপুরি শরীরের উপর নির্ভরশীল কিন্তু জেন্ডার বা লিঙ্গ নির্ভররশীল সমাজের উপর। যেহেতু নারী বা পুরুষের দায়িত্ব, কাজ ও আচরণ মোটামুটি সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, তাই সমাজ পরিবর্তন বা সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে লিঙ্গের ধারণা বদলে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- আমরা যখন কাউকে 'নারী' বা 'পুরুষ' হিসেবে চিহ্নিত করি তখন সেখানে জৈব-লিঙ্গ নির্দেশ করাটাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু 'মেয়েলি' বা 'পুরুষালি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নারী বা পুরুষের লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে স্বভাব-আচরণগত ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। আর এ কারণে সেক্সকে জৈবলিঙ্গ এবং জেন্ডারকে আমরা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক লিঙ্গ বলে অভিহিত করতে পারি।

উভলিঙ্গ মানুষদের ইংরেজিতে অভিহিত করা হয় হার্মফ্রোডাইট বা ইন্টারসেক্স (আন্তঃলিঙ্গ) হিসেবে। উভলিঙ্গত্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়— প্রকৃত উভলিঙ্গত্ব (True-hermaphrodite) এবং অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব (Pseudo-hermaphrodite)। প্রকৃত উভলিঙ্গ হচ্ছে যখন একই শরীরে স্ত্রী এবং পুরুষ যৌনাঙ্গের সহাবস্থান থাকে। যেমন আলোচ্য উপন্যাসের তৃপ্তি জন্ম থেকে মেয়ে হয়ে মেয়েদের স্কুলে পড়াশুনা করে বিশ্বজয়ী খেলোয়াড়। কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়েছে তার দেহে নারী ও পুরুষের উভয় যৌন প্রত্যঙ্গ বর্তমান। তবে প্রকৃতিতে প্রকৃত উভলিঙ্গত্বের সংখ্যা খুবই কম। বেশী দেখা যায় অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব। যখন কোন ব্যক্তি এক যৌনতার প্রাইমারি বা প্রাথমিক যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম নেয় কিন্তু অপর যৌনতার সেকেন্ডারি বা গৌন যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে তখন তাকে অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব বলে। সাধারণত ছয় ধরণের অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব দৃশ্যমান– কনজেনিটাল এড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH), এন্ড্রোজেন ইন্সেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম (AIS), গোনাডাল ডিসজেনেসিস, হাইপোস্পাডিয়াস, টার্নার সিন্ড্রোম (XO) এবং ক্লাইনেফেল্টার সিন্ড্রোম (XXY)। উভলিঙ্গত্বের বিভিন্ন উপসর্গের উদ্ভব শারীরিক ও সামাজিক বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে।[৪]

দক্ষিণ এশিয়ার ইন্টারসেক্স এবং রূপান্তরকামী সম্প্রদায়কে প্রচলিতভাবে 'হিজড়া' নামে অভিহিত করা হয়। তবে, হিজড়া শব্দটি খুব তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় বলে কিছু লেখক সাম্প্রতিক কালে 'উভলিঙ্গ মানব' শব্দটি সামাজিকভাবে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছেন[৫]। অনেকে হিজড়া মানুষেরা 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতির দাবী করে আসছেন বহুকাল থেকে। যে সমস্ত হিজড়া বা উভলিঙ্গ মানবরা শারীরিকভাবে পুরুষ, কিন্তু মানসিকভাবে নারী স্বভাবের সে সমস্ত উভলিঙ্গ মানুষদের পল্লীতে ডাকা হয় 'অকুয়া' হিসবে। অন্য দিকে যে সমস্ত উভলিঙ্গ মানবরা শারীরিকভাবে নারী, কিন্তু মানসিকভাবে পুরুষ, তাদের বলা হয় 'জেনানা'। এছাড়া সামাজিক প্রথার শিকার হওয়া মনুষ্যসৃষ্ট উভলিঙ্গ মানুষদের (এরা আসলে রূপান্তরকামী) বলা হয় 'ছিন্নি'।

উপরিউল্লিখিত বহুবিধ তত্ত্বগুলির নিরিখে আধুনিক কালের কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের তাত্ত্বিক প্রয়োগের দিকগুলি বিশ্লেষণ করব। ২০১৫ সালে প্রকাশিত উপন্যাসটির কথক অনিকেত বন্দ্যোপাধ্যায়, আকাশবানী কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোগ্রাম এগজিকিউটিভ। উপন্যাসের কাহিনির সূচনা ১৯৯৫ সাল। তখন পৃথিবীর নানা দেশে জেন্ডার তথা লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে ঝড় উঠেছে। উপন্যাসের সমাপ্তিকাল অগাস্ট ২০০৯। কিন্তু এর প্রায় দুই দশক পূর্বের নানা ঘটনা কাহিনিতে স্থান পেয়েছে। ১৯৯৫ সালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে লেখকের পরিকল্পনাতে শুরু হয় 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠান। লেখক জানিয়েছেন,

"ওটাই ছিল বীজ, তারপর নিজের আগ্রহে বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ, বিভিন্ন পত্রিকা ঘাঁটা, উপন্যাসের প্লট তৈরী"[৬]

লেখক কাহিনীর মাধুর্য ও সুষমা বজায় রাখতে গল্পের আবহে তত্ত্বকথা পরিবেশন করেছেন। কাহিনির বিস্তারে সাহায্য নিয়েছেন ঋতুপর্ণ ঘোষ, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, 'রূপান্তরিত' অধ্যাপিকা মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা ভাষার 'হিজড়া' গবেষক অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, প্লাস্টিক সার্জেন কলিন রায়, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপলজির ডাক্তার অধ্যাপক পরশমণি দাশগুপ্ত সহ ওয়েবসাইট ও উইকিপিডিয়ার নানা তথ্যের। উপন্যাস পাঠ করে আমরা সহজে অতি জটিল তত্ত্ব কথার সরলীকৃত রূপ সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান লাভ করতে পারি।

কলকাতা আকাশবাণী কেন্দ্রের স্টেশন ডিরেক্টর সুমিত চক্রবর্তীর নির্দেশে 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানে মতামত দিতে আসা ডাক্তার, সমাজতাত্ত্বিক, মনোবিদ, সাহিত্যিকদের পর্যবেক্ষণের নিরিখে হোমোসেক্সুয়াল ছেলে মেয়েদের বার্তা দিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাইক্রিয়াটিস্ট অমিত বসু 'অনুস্টুপ' পত্রিকায় ভারতীয় সংবিধানের ৩৭৭ ধারার বিরোধিতায় লিখেছেন,

> "এটা ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী। যৌন অভ্যাস মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। যদি সমাজের কোনও ক্ষতি না করে, অন্য কোনও ব্যক্তির অসুবিধা না ঘটিয়ে কেউ যৌনাচার করে, তবে তার ব্যক্তিগত যৌনাচারে রাষ্ট্রের নাক গলানো উচিত নয়।"[৭]

অমিতবাবুর কথায় জানতে পারি কলকাতার 'গে' দের সংস্থার নাম 'থটশপ'। ডিরেক্টর পবন ধল। তাঁর কথাতে জানতে পারি,

> "গোলাপের রং তো আমরা গোলাপি-ই বুঝি। পিংক। কিন্তু গোলাপ যদি সাদা কিংবা হলুদ হয়, তবে কি সেটা গোলাপ নয়? আমরাও পুরোপুরি মানুষ। মানুষের সমস্ত ধর্ম আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে শিল্পী সত্ত্বা আছে, পরের জন্য দুঃখবোধ আছে, সমাজ সচেতনতা আছে, আবার হিংসা পরশ্রীকাতরতাও আছে। শুধু ব্যক্তিগত যৌনতার ক্ষেত্রে আমরা আলাদা।"[৮]

১৯৯৩ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে 'কাউন্সেল ক্লাব'। লেসবিয়ান, গে, সমকামী, উভকামী তথা যৌনতার পরিচয় নির্বিশেষে সকল মানুষের সামিল হওয়া ও মত বিনিময়ের প্রতিষ্ঠান। 'প্রবর্তক' পত্রিকার মাধ্যমে এরা সমকামীদের মনের কথা, ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা করে। সমাজতাত্ত্বিক মালা ভদ্র জানিয়েছে,

> "মানুষের বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন এর মধ্যে নানারকম কালার আসতেই পারে। সমকামিতাও একটা কালার। "[৯]

শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের আত্মপ্রতিষ্ঠার কথায় লিঙ্গ বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক তত্ত্বকথার বিস্তার ঘটেছে।

কুইর তত্ত্ব মানুষের লিঙ্গ বৈষম্য, যৌন পরিচয়, বিশেষাধিকার, নিপীড়ন ইত্যাদি বিষয়ের শ্রেণীবিন্যাস ব্যাখ্যা ও প্রতিযোগিতা বিশ্লেষণ করে। এই তত্ত্ব সময়ান্তরে বিবর্তিত হতে থাকে। 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে লিঙ্গ পরিচয়ের নিরিখে আমরা চার ধরনের বৈচিত্র্য সম্পন্ন চরিত্রের পরিচয় পাই। আধুনিকালের লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার ও আসেক্সুয়াল তত্ত্বের প্রতীক হিসেবে চরিত্রেরা উপন্যাসে এসেছে। দূরদর্শনের খেলাধুলা বিভাগের মহিলা বক্সার আইভি ও তৃপ্তি বিশিষ্ট অর্থে লেসবিয়ান চরিত্র। কারণ আইভি মেয়ে হয়েও বাইক চালায়, পুরুষ সুলভ আচরণ করে। সিকিউরিটি অফিসারের চাকুরিতে ইন্টারভিউ দিয়ে কাজে যোগ দেয়। বহিরঙ্গে নারী হয়ে নিজেকে পুরুষ ভেবে অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় বলেই সে লেসবিয়ান। রেডিওর 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানের কথা প্রসঙ্গে নিয়ে লেখক বলেছেন,

> "স্পোর্টস দেখে যে মেয়েটা, আইভি রায়, যে বাইক চালিয়ে অফিসে আসে, মাঝে মধ্যে সিগারেটও খায়, ও বলল, কনগ্র্যাটস্ অনিকেতদা, তুমি যে এ জিনিস করতে পারবে, ভাবিনি।"[১০]

তৃপ্তি সামন্ত জন্মের সময় মেয়ে হলেও মনে মনে পুরুষভাবাপন্ন। তাই তার বাড়ির রান্নার মাসি সুমিতা হালদারের সঙ্গে যৌন কর্মে লিপ্ত হয়। ধরা পড়ে ১৪ দিনের জেল হাজত বাস। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা যায় তৃপ্তির অণ্ডকোষ পেটের ভেতর ঢুকে আছে, আর লোমশ ক্লিটোরাসটি একটু বাইরে বেরোনো। লেখকের কথায়,

> "বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী তৃপ্তি মেয়ে, পরী ছেলে, সুতরাং হেট্রো সেক্সুয়াল। আবার পরী ওর সার্টিফিকেট মানে না। ও ওরিয়েন্টেশন-এ মেয়ে। নিজেকে মেয়ে ভাবে। সুতরাং তৃপ্তির সঙ্গে ওই আলিঙ্গন 'সাফো আলিঙ্গন'। লেসবিয়ান। আবার পরি লিঙ্গগত চিহ্নে পুরুষ, আর তৃপ্তি নিজেকে 'পুরুষ' ভাবছে। ওর পুং লিঙ্গটি নেই, বানাতে চায়। তৃপ্তিও মনে মনে পুরুষ। সুতরাং পরির সঙ্গে এই আলিঙ্গন 'সাদোমিক'। 'হোমো সেক্সুয়াল'। আবার তৃপ্তি যদি মানসিকভাবে পুরুষই হয় তবে পরি মানসিকভাবে নারী। সুতরাং এটা হেট্রো সেক্সুয়াল অ্যাক্ট।"[১১]

উপন্যাসের চরিত্রগুলি বার বার নানাভাবে নিজেদের যৌন অবস্থান থেকে সরে যেতে থাকে। মনন মানসিকতার সঙ্গে ক্রোমোজোম ও জিনগত বৈশিষ্ট্য যে এসব ক্ষেত্রে অনেকখানি দায়ী সেকথার নিখুঁত পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

উপন্যাসের বৃহত্তর অংশ জুড়ে রয়েছে 'গে' শ্রেণিভুক্ত মানুষদের পরিচয়। অনিকেতের ছোটোবেলার বান্ধবী মঞ্জুর ছেলে **পরিমল ওরফে** পরি, হিজড়ে হওয়া দুলালের ছেলে মন্টু, চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও সেতার বাদক পবন ধল, 'প্রবর্তক' পত্রিকার সম্পাদক ও ইংরেজীর অধ্যাপক অনির্বাণ, অ্যাড এজেন্সির কর্মী সঞ্জয়, বাংলায় এম. এ. বাসব, এক্স মিলিটারি মিস্টার বক্সী— এরা স্বঘোষিত 'গে' চরিত্র। গে' রা তিন ধরনের— টপ, বটম ও ভার্সেটাইল। টপরা পেছন দেয়, বটমরা নেয়, ভার্সেটাইলরা কখনো দেয়, কখনো নেয়। উপন্যাসের নায়ক পরিমল জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত লিঙ্গে পুরুষ। কিন্তু মনে মনে নারী। স্কুলে পড়ার সময় থেকে তাঁর লিপস্টিক, চুরি, শাড়ির প্রতি অধিক টান। রান্না থেকে ঘর গোছানোর কাজে তার অধিক মনোযোগ। তাঁর জীবনের স্বপ্ন ফ্যাশান ডিজাইনার হওয়া। কাহিনীর শুরুতেই মঞ্জু রেডিওর অনুষ্ঠানের সাইক্রিয়াটিস্ট চয়ন বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে জানতে পারে যে, কোনো কোনো মানুষের এরকম আচরণটা স্বাভাবিক। চয়ন বসু পরিমল এর কথা প্রসঙ্গে মঞ্জুকে বলেছে,

> "সব সমকামীরা মেয়েদের পোশাক পরতে ভালোবাসে এমন নয়, কিন্তু যারা মেয়েদের মতো পোশাক আর সাজসজ্জা করে, তারা সাধারণত সমকামী-ই হয়। আবার যারা মেয়েদের সাজসজ্জা করতে ভালোবাসে, ওদের বলে ট্রান্সভেসটাইট। তারা ওখানেই সীমাবদ্ধ না থেকে আনেকে পুরো নারী হতে চায়। এদের বলে রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডার।"[১২]

পরিমলের চাইতে ছ-সাত বছরের বড় টিউশান মাস্টার অরূপ দা তাকে ভালবাসে। দীর্ঘদিনের মেলামেশায় পরি জানতে পেরেছে যে অরূপ দা একাধিক ছেলে ও মেয়েদের সঙ্গে যৌন মিলনে আত্মতৃপ্তি বোধ করে। সুতরাং সে উভকামী বা 'ডবলডেকার'। অরূপ দার বিশেষ বান্ধবী বা প্রেমিকা হল তৃষ্ণা। কিন্তু পরি যৌন চেতনায় পূর্ণাঙ্গ 'গে' চরিত্র। সে অরূপের সম্পর্কে সব কথা জেনেও তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করতে দ্বিধা করে না। কারণ মনে মনে নারী, বহিরাবয়বে পুরুষ পরি একজন পুরুষকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চায়। এক্ষেত্রে যদিও মানসিকতায় নারী বলেই অরূপের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পেরে পরি মানসিক তৃপ্তি পাচ্ছে। সমাজের চোখে এরা অপরাধী। দুলালের ছেলে মন্টু স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে অন্য ছেলের সঙ্গে জড়াজড়ি করে। সে সম্পূর্ণরূপে 'গে' চরিত্র। শুক্লার কাছে থাকার সময়, বিকাশের বাড়িতে, মন্টু একই আচরণ করেছে। তাই তো 'গে' সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'বোম্বে দোস্ত', 'প্রবর্তক', সানফ্রান্সিসকো থেকে প্রকাশিত 'Next' পত্রিকাগুলি 'গে' সমাজের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করে চলেছে। পরিমল তাই মনে প্রাণে পূর্ণাঙ্গ নারী হতে সিলিকন ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট, পেনেকটমি, গ্রাফটিং, সার্জারি করে যোনি তৈরি করে নেয়। অরূপদার উভকামিতার কারণে পরি এখন তাকে পাত্তা দেয় না। পরীর নতুন সঙ্গী জুটে যায় চয়ন মল্লিক। সেও অরূপের বয়সী। কবিতা লেখে। কবিতা নিয়ে পরীর সঙ্গে আলোচনা করে। শেষ পর্যন্ত তারা সমলিঙ্গ ধারী দুই পুরুষ বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি পরি ও চয়ন মল্লিক দুজনে সামাজিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে অনিকেত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার অসুস্থ স্ত্রী শুক্লার বাড়িতে। লেখক যেন মনে প্রাণে এই 'গে' সম্প্রদায়ের মানসিক আইনি নিয়ন্ত্রণকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। ফ্রয়েড, ইয়ুং, পাভলভ, ডনকিনস দের জিন, ক্রোমোজোম তত্ত্ব হেরে গেছে মানুষের মনের কাছে। এখানেই সাহিত্য তত্ত্বের চাইতে একধাপ এগিয়ে গেছে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭৭ ধারার উপর নিষেধাজ্ঞা পেতে ২০১৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখক পরীকে মুক্ত করে দিয়েছেন ২০১৪ সালের ১৫ই অগাস্টে। সময়ের চাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তিনি।

কাহিনির দুলাল মৃধা জন্ম লগ্ন থেকে ছেলে, স্বভাবে মেয়ে। খাজাইতলার দুলাল ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করে পুরোপুরি পুরুষ হতে পারেনি। নিজের স্ত্রী সন্তান দিলেও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে পানাগড়ে গুরুমা নাগেশ্বরী হিজড়ার খোলে স্থায়ী আশ্রয় বেছে নেয়। কাঁচা আনাজের ব্যবসা ছেড়ে সে সাইকেলে করে আলতা, সিঁদুর, পাউডার, চুড়ি, মালা, ক্লিপ, ব্লাউজ, ব্রা নিয়ে ফেরি করতে ভালোবাসে। গ্রামের পাড়ায় মধ্যাহ্ন দুপুরে বাড়ির মেয়েছেলেদের সঙ্গে মেয়েলি কথায় পটু দুলাল। বাড়িতে ছেলে মন্টু, মিনমিনে স্ত্রী ও মা থাকলেও সংসারের প্রতি তার কোনো টান নেই। আলতা সিঁদুর বিক্রি করতে করতে সে ফুলি, চাত্তারা, হাসি, ময়নাদের হিজড়ের দলে যোগ দেয়। চলে যায় বর্ধমানের পানাগড়ের খোলে। দুলালের পুরুষ থেকে মেয়েভাবাপন্ন হিজড়ে হওয়ার কথাতে আমরা হিজড়েদের লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘরোয়া পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। 'কোতি' স্বভাবের দুলালের 'ছিন্নি' হওয়া, 'নথ ভাঙা', 'লিকম' বসার অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিপূর্ণ হিজড়া হয়ে যাবার কথা জানতে পারি। এক কথায় দুলাল হল পুরুষ সমকামী। বলতে পারি বটম গে। কিন্তু সম্পূর্ণ রূপান্তরিত দুলাল হল ট্রান্সজেন্ডার চরিত্র। LGBT তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক সমকামী চরিত্রেরা কোনও না কোনও অর্থে লিঙ্গ পরিবর্তনকামিতায় বিশ্বাস করে।

'বাইসেক্সুয়াল' শব্দটি পুরুষ এবং নারী উভয়ের সঙ্গে যৌন বা রোমান্টিক অনুভূতির ইঙ্গিত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাহিনিতে পরীর চাইতে বছর ছয়েকের বড় অরূপ দা পরীর সঙ্গে পেছন কর্ম করে। তার আবার তৃষ্ণা নামের মেয়ে বন্ধু বা যৌন সঙ্গীও আছে। তাই সে উভকামী (Bisexual) চরিত্র। অরূপের কাছেই পরি প্রথম পায়ুদেশে লিঙ্গ ঢুকিয়ে নিয়ে যৌনতার স্বাদ পেয়েছিল। শুনেছিল বিদেশের বাজারে 'কিডু' বিক্রয়ের কথা। কে ওয়াই জেলি, ঢেঁড়স ভিজিয়ে পিচ্ছিল পদার্থ তৈরির কথা। ফ্যান্সি মার্কেটে তৃষ্ণার সঙ্গে পরির দেখা হয়ে গেলে পরিচয় করিয়ে দেয়। তখন থেকেই পরি জানে অরূপ বাইসেক্সুয়াল। কিন্তু এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করে না। পরি অরূপের আচরণের কথায় বলেছে,

> "অরূপ দা, তুমি সেই কবে থেকে বলতে, সারা পৃথিবী জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে, নরওয়ে-সুইডেনে সমলিঙ্গে বিয়ে 'লিগ্যাল' হয়ে গিয়েছে, আমেরিকার কয়েকটা স্টেটেও। আরও কয়েকটা দেশেও হয়ে যাবে। আমাদের দেশেও হবে। ৩৭৭ ধারার এগেইন্সটে 'নাজ ফাউন্ডেশন' মামলা করেছে। অ্যাইসা দিন নেহি রহেগা... বলতে বলতে আমার পিঠে হাত বুলোতে... তখন কি বুঝেছি, তুমি 'ডবলডেকার'? তুমি 'বাইসেক্সুয়াল'?"[১৩]

পরে পরি বুঝেছিল অরূপদার আরও একাধিক বাট্টু পার্টনার আছে। একই সঙ্গে অরূপ ছেলে ও মেয়ে সঙ্গীর সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করেছে। অরূপের কথাতে এসেছে 'লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়াল ট্রান্সজেন্ডার' প্রসঙ্গ। উপন্যাসে বারবার এই কথাগুলি ঘুরে ফিরে আসে আর আমদের সচেতন চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে যেতে থাকে। পরি অরূপদার উভকামিতা দেখে পুণরায় আকৃষ্ট হয়েছিল অন্য একজন কবিতা লিখতে জানা পুরুষ চয়ন মল্লিকের প্রতি। কিন্তু পরি জেনেছিল চয়নের ছাত্রী পূজার সঙ্গেও তার সম্পর্ক আছে। অনিকেতের মামাতো ভাই নিঃসন্তান বিবাহিত বিকাশ বাড়িতে নিরাশ্রয় মন্টুকে রেখে তার সঙ্গে যৌন আচরণ করতে দ্বিধা করেনি। বহু সঙ্গমে বিকাশের স্ত্রী পারমিতা সন্তান দিতে না পারায় দত্তক পুত্র নীলের মৃত্যুর পর একাকীত্ব থেকে মুক্তি পেতে সে অনিকেতের প্রস্তাবে রাজি হয়ে মন্টুকে বাড়িতে এনেছিল। বিকাশ একাধিক নারীকে চিত করতে পেরে আনন্দ ও সুখ অনুভব করত। সে তো বহুকামী চরিত্র।

উপন্যাসে অলোক, রতন, সোমনাথ, পরিমল, দুলাল সকলেই 'ট্রান্সজেন্ডার' চরিত্র। এরা কেউ নিজের লিঙ্গ পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। বহিরঙ্গে প্রকৃতি নির্ধারিত পুরুষ হলেও এরা প্রত্যেকে নিজেদের লিঙ্গ পরিচয় ছেড়ে

বিপরীত লিঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছে। পরিমলের কলেজের ছাত্র অলোক হালদার তাই হয়ে যায় আলোকা। রবীন্দ্র সদনে পরীর সঙ্গে রতন জড়াজড়ি করার সময় ধরা পড়ে গেলে সেই যৌন ক্রিয়া হয়ে যায় লেসবিয়ান অথবা গে'দের কার্যকলাপ। রতন নিজের ছেলে পরিচয় ছেড়ে বুকে 'ইলু' লাগিয়ে সেজে গুজে রত্না হতে চায়। দুলাল মৃত্যু মুখে পতিত হয়েও হাসপাতালে নিজের নাম দুলালী লেখায়। কলেজের অধ্যাপক ও 'অবমানব' পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মানবী নামের মহিলা অধ্যাপক বা অধ্যক্ষা হতে চায়। মানবী ২০০৫ সালের ১৬ জুলাই এ আনন্দবাজার পত্রিকার ইন্টারভিউ এ জানিয়েছে ঝাড়গ্রাম কলেজে চাকুরি করার সময় অভিজিৎ পাহাড়ী কে বিয়ে করে। বিয়েটা দুমাসও টেকেনি। পরি মানবীদি'র কাছে লিঙ্গ পরিবর্তনের বিষয়ে কোলকাতার ডাক্তারদের সম্পর্কে খবর নেয়। পরিমল ছেলে হিসেবে মঞ্জুর ঘরে জন্মালেও পরি নামের ট্রান্সজেন্ডার চরিত্র। মা মঞ্জুর বন্ধু হিসেবে পরিচিত অনিকেত কাকুকে অতি আপন ভেবে মনের ইচ্ছের কথা জানিয়েছে,

> "আমার গায়ে 'গে' ষ্ট্যাম্প লেগে থাকুক — এটা ভাল্লাগে না। আমি 'গে' না কাকু, আমি মেয়ে। বাইরের খোলসটা ছেলের। রাস্তায় যে বহুরূপী ঘোরে, কালী সাজে, ও কী কালী? কালীর খোলসের ভিতরে নিমাই কিংবা পাঁচু বা অন্য কেউ। আমি সত্যি সত্যি মেয়ে...। [১৪]

তাকেই উপন্যাসের নায়কের আসন দিতে পারি আমরা। এল.জি.বি.টি.'র তত্ত্বকে পরি মেনে নিতে চায়নি। বরং মনের ইচ্ছাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাত্ত্বিক প্রয়োগের দিক ও অস্ত্রোপাচারের দ্বারা যৌন লক্ষণ পালটে নেওয়ার বিষয়টি লেখক পরির মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্য' গ্রন্থের 'সুবর্ণ গোলক' প্রবন্ধে মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে সে কারণেই হয়তো লিখেছিলেন,

> "তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, ...কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রী লোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে?"[১৫]

উপন্যাসের সমগ্র কাহিনিতে লেখক সচেতনভাবেই LGBT তত্ত্বের যথার্থ প্রকাশ ও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এখানে Lesbian (সমকামী স্ত্রীলোক), Gay (সমকামী পুরুষ), Bisexual (উভয়কামী নারীপুরুষ), Transgender (লিঙ্গ রূপান্তরকামী) মানুষদের যেমন দেখিয়েছেন তেমনি এদের মধ্যেই পিডোফিল (শিশুদের প্রতি যৌনতায় আকৃষ্ট), ম্যাসোসিস্ট (যারা মারধোর খেলে তৃপ্তি পায়), স্কোপোফিলিক (যারা কেবল দেখতেই ভালবাসে), জেরান্টোফিলিক (যাঁদের বৃদ্ধ বৃদ্ধায় আকর্ষণ), নেক্রোফিলিক (পুতুল বা মৃত মানুষে যৌন আকর্ষণ) ইত্যাদি বহুবিধ যৌন ক্রিয়ার প্রকারের কথা বলেছেন। মানব মনস্তত্ত্বের জটিলতাকে লেখক নানা উপায়ে সংযোজিত করেছেন। দেখিয়েছেন ভারতবর্ষ ব্যাপী হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়া, নৃশংস উপায়ে লিঙ্গ চিহ্ন ও অণ্ডকোষ ছেদনের কৌশল। বিশ্বব্যাপী এই বৃহত্তর সংখ্যার মানুষদের সমস্যা সংকটের কথা তুলে ধরেছে বিভিন্ন এন.জি.ও. সংস্থা, পত্র পত্রিকা থেকে এল.জি.বি.টি. সম্প্রদায়ের নানা সংগঠন। রেডিওর অনুষ্ঠানের পরামর্শদাতা সমাজতাত্ত্বিক মালা ভদ্র বলেছেন,

> "শুধু আমরা কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে ঝগড়া চলছে। কেউ বলছে এটা মানসিক রোগ, কেউ বলছে জেনেটিক, কোন দেশে এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, আমাদের দেশে ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী পশুমেহন যেমন অপরাধ, সমকামিতাও। আবার অনেক দেশে সমকামিতার স্বীকৃতিও আছে, সমকামীরা বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে পারে।" [১৬]

এভাবেই তত্ত্ব ও তথ্য একাকার হয়ে রয়েছে উপন্যাসের অটুট গাঁথুনিতে।

একবিংশ শতকের দুই দশকের অভিজ্ঞতা প্রসূত উল্লিখিত তত্ত্বের বিচারে আমরা বলতে পারি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের মধ্যে সামাজিক, আইনি স্বীকৃতির সুদূর প্রসারী ফলাফল আসন্ন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি থেকে

রাষ্ট্রসঙ্ঘ যখন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে, তার সুফল আবশ্যই মিলবে। কিন্তু এল.জি.বি.টি. পরিচয় ছেড়ে তৃতীয় লিঙ্গ পরিচয়ে বাঁচতে চাওয়া মানুষদের মনের অধিকারটুকু যাতে অন্য শ্রেণির মানুষেরা অপব্যবহার না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যয় বহুলতা, যৌন চিহ্ন পরিবর্তনে ইচ্ছুক মানুষের সংখ্যা যাতে অকারণ বৃদ্ধি না পায়, সেদিকে সর্বদা সচেতন দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজন। উপন্যাসে পরির উপরওয়ালা মালিক সিদ্ধেশ গর্গ, যেভাবে তার সিলিকন ব্রেস্টের সুখানুভবে ফ্লুয়িড বেলুন ছিদ্র করে দিয়েছে তাতে তার জীবন বিপন্ন। ডাক্তার তীর্থঙ্কর বসু পরির অপারেশন এর আগে যেভাবে দেশ বিদেশের গল্প শুনিয়ে কাউন্সেলিং করিয়েছিলেন তাতে কোনও কাজ হয় নি। শেষ পর্যন্ত সে দোতলা ও একতলায় সার্জারি করিয়ে পরিপূর্ণ মেয়ে হয়েছে। চয়ন মল্লিককে বিয়ে করে সুখ খুঁজে পেতে চেয়েছে। কিন্তু সবশেষে একটি কথা বলা চলে, জীবনের সব পরিণতি সুখের হয় না। এভাবে উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে লেখক যে তত্ত্বের সত্য প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তা পাঠকের মননকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সত্যের পরিচয়ে একালের এক বিশিষ্ট রচনা হিসেবে পরিগণিত হবে 'হলদে গোলাপ' উপন্যাস।

তথ্যসূত্র :

১. ১৫ই এপ্রিল ২০১৫, আনন্দ বাজার পত্রিকায় গৌতম চক্রবর্তীর প্রতিবেদন।
২. https://en.wikipedia.org/wiki/Queer_theory
৩. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3215279)
৪. https://bn.wikipedia.org/wiki
৫. রায়, অভিজিৎ, সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, শুদ্ধস্বর (ই-বুক মুক্তমনা), ৯১ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৫১
৬. ১৫ই এপ্রিল ২০১৫, আনন্দ বাজার পত্রিকায় গৌতম চক্রবর্তীর প্রতিবেদন।
৭. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, হলদে গোলাপ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৫, পৃ. ৭১
৮. ঐ, পৃ. ৭৩
৯. ঐ, পৃ. ৬৪
১০. ঐ, পৃ. ৩১
১১. ঐ, পৃ. ৫৩৪
১২. ঐ, পৃ. ৯৩
১৩. ঐ, পৃ. ৩৪৬
১৪. ঐ, পৃ. ৩৫৬
১৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৯১, পৃ. ২৫২
১৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, হলদে গোলাপ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৫, পৃ. ৬৫